যুগান্তর

তারিখ 30 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

শিক্ষা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধি

আমাদের স্বপ্নগুলো কি মাঠে মারা যাবে?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বেশকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি। এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে একজন ছাত্রের সব মিলিয়ে জমা দিতে হবে ৫০০০-৬০০০ টাকা। পাশাপাশি প্রতি সেশনে ভর্তি ফি, ফরম ফিলাপ ফি এবং হল চার্জসহ দিতে হবে ৩৫০০ টাকারও অধিক। এত টাকা দেয়ার সামর্থ্য যদি না থাকে তাহলে বিবেচনা করা হবে না তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মেধা কতটুকু। অতএব শিক্ষা গ্রহণের মাঝপথে ইস্তফা দিতে হবে তাকে। টাকার কাছে জলাঞ্জলি যাবে তার স্বপ্ন। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সরকারের। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এটিই এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল। কর্তৃপক্ষ গত ৩০ জুন সিন্ডিকেটের ৪৪০তম সভায় শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন, আবাসিক হলের ফি ও সেশন ফিসহ বিভিন্ন ফি বৃদ্ধি করেছে।

২০০৫ সালের সিন্ডিকেটের ৪২৫তম সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরীকে প্রধান করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কেএম গোলাম মহিউদ্দিন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান ও উপ-হিসাব নিয়ামক ফরিদুল আলম চৌধুরী। এ কমিটি সিন্ডিকেটের ৪৪০তম সভায় তাদের রিপোর্ট পেশ করে।

সিন্ডিকেটে এ রিপোর্টকে কিছুটা সংশোধন করে নেয়া হয় শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতনসহ বিভিন্ন ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। এতে মাসিক বেতন ১২ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০ টাকা বেড়েছে বিজ্ঞান অনুষদ ছাড়া অন্যান্য অনুষদের শিক্ষার্থীদের। অন্যদিকে মাসিক বেতন ১৫ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ টাকা করা হয় বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের। ৫০০ থেকে ১২৫০ টাকা হয়েছে আবাসিক শিক্ষার্থীদের হল ফি এবং পরিবহনে ৪৭৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৩০ টাকা, সনদপত্র ও ফি'র ক্ষেত্রে প্রস্তাব এসেছে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা করার। রেজিস্ট্রেশন ২৪০ থেকে ২৬৪ টাকা, শিক্ষা উন্নয়ন, গ্রন্থাগার ও সংস্থাপনসহ অন্যসব খাতে ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে ১০ শতাংশ হারে।

এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের সেশন ফি ৪০০ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে ৫০০ টাকায়, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি ৫০০ থেকে বৃদ্ধি করে ১০০০ টাকা, ৪৮০ টাকার বিনিময়ে ভাষা কোর্সকে দুর্মূল্যের পণ্যে পরিণত করা হয়েছে ২০০০ টাকায়। এমফিল ও পিএইচডি ফি ৭০০০ থেকে ১৪০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে (!), বাদ পড়েনি চিকিৎসা খাতও। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় সিংহভাগ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। এদের পক্ষে একসঙ্গে অনার্স ভর্তি ফি যেখানে ৯৫২ টাকা (কলা অনুষদ) দিতে কষ্ট হয় সেখানে ১ হাজার ৩৩২ টাকার বোঝাকে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না। আমরা সচেতনভাবেই মনে করি, দেশে জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে একলাফে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করাকে উচ্চশিক্ষা থেকে মধ্যবিত্তকে দূরে রাখার এ এক বিশেষ ষড়যন্ত্র। গত মাসে প্রশাসন যেভাবে রেতনসহ বিভিন্ন ফি বৃদ্ধি করেছে, তাতে আমাদের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যেন ব্যবসা আর ব্যবসা। এ যেন সার্টিফিকেট বিক্রির এক প্রশাসনিক আয়োজন।

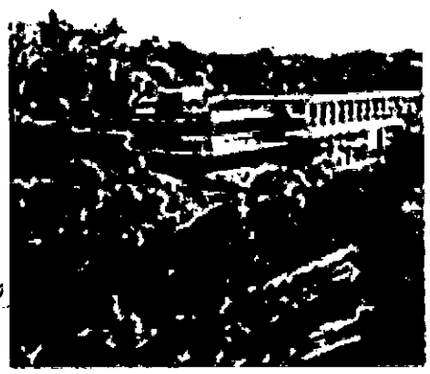

এবার আসল কথায় আসি। গত ১২ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছিল, তখনই ঘটল 'অঘটন'টি। অঘটন বলার কারণ, এ ঘটনাটিকে আমরা সহজভাবে নিতে পারছি না। কী হয়েছিল সেদিন? ১২ তারিখে সবুজ প্রকৃতির এ ক্যাম্পাসে এসেছিলেন পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিশেষজ্ঞ (!) নরম্যান লরেণসহ বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিনিধি দল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক উপাচার্য মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে তারা ক্যাম্পাসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর করেছেন ভূয়সী প্রশংসা। কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভাঙলো তার পরের দিনের একটি স্থানীয় দৈনিক। উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের নাকি সোজা পরামর্শ ছিল— 'অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির নামে শিক্ষার্থীদের বেতনসহ ফি বৃদ্ধি'। তাহলে কী আমরা ভাবতে বাধ্য হব, দেশের পাটকল, ব্যাংক, বিমানের পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আসবে বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে? তবে কী আমরা ভাবতে বাধ্য হব, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে উচ্চবিত্তের শিক্ষা ক্রয়কেন্দ্রে পরিণত হতে যাচ্ছে?

স্বভাবতই এই আক্রমণের (!) মুখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তার সঠিক চরিত্র নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। একদিকে বাড়ছে হলচার্জ অন্যদিকে ডাইনিংয়ের পচা খাবার, অধিকাংশ সিটেই ডাবলিং, পানি ও বিদ্যুৎ সংকট বাড়ছে উত্তরোত্তর। যাতায়াতের প্রধানতম মাধ্যম মুমূর্ষু শাটল ট্রেনে ছাত্রদের আসতে হয় জীবন বাজি রেখে; নিরাপত্তাহীনভাবে। বিজ্ঞান অনুষদের ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতির অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় চলছে ধুঁকে ধুঁকে। লাইব্রেরি সেমিনারে নেই যুগোপযোগী বই-জার্নাল। মুখ থুবড়ে পড়ছে শিক্ষা ও গবেষণা খাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ খ্যাত এ সেন্টরে এখন বরাদ্দ নেই বললেই চলে। অথচ অবাক করার কথা হল, ফি বাড়ানো হয়েছে উপরোক্ত খাতগুলোতেই। এসব সমস্যার দিকে প্রশাসনের কোন খেয়ালই নেই। বরং উল্টো বেতন-ফিসহ বিভিন্ন ফি বৃদ্ধি করে সমস্যাসংকুল করে দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

গত কিছুদিন আগে কলা অনুষদের কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধনে অধ্যাপক বদিউল আলম বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বগ্রামের এই যুগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা যেন তাল মিলিয়ে চলতে পারে তার জন্যই এ ল্যাব। আগামী দশ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে'। এরও কিছুদিন পর ফি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'যুগের চাহিদা অনুযায়ী বেতন-ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে'। এ বাক্যগুলোর সরল ব্যাখ্যা হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক আয় যত হবে ব্যয়ও ঠিক তার ভিত্তিতেই হবে। এক্ষেত্রে আয়ের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান উৎস হল 'ছাত্র বেতন-ফি বৃদ্ধি'। বক্তব্য শুনে মনে হল, দেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের বক্তব্য শুনছি। তিনিও প্রায় একই ভাষায় আর একই ভঙ্গিতেই এমন কথা বলতেন।

এভাবেই আজ আমাদের স্বপ্নগুলো মাঠে মারা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এহেন নামে-বেনামে ফি বৃদ্ধির কসরত করে আসছে অনেকদিন থেকেই। আর জরুরি অবস্থা নামক গামছাকে কোমরে পেঁচিয়ে উঠেপড়ে লাগলো ছাত্র বেতন-ফি বাড়াতে। প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তকে আমরা যদি মেনে নিই তবে মোটা অংকের টাকা গুনতে নাভিশ্বাস উঠবে আমাদের অভিভাবকদের। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়, আমাদের অভিভাবকরা এসব কাজে আপনার ওপর খুব নাখোশ। তারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাদের সঙ্গে আপনি যদি ১২ তারিখের মতো বৈঠক করেন তাহলে খুব ভালো হয়। আপনার সময় হবে কি? মাননীয় উপাচার্য মহোদয় জানেন আমাদের অভিভাবকরা, যাদের নামে কোন দুর্নীতির মামলা নেই, নেই বৈদেশিক ফ্ল্যাট, নেই বাগানবাড়ি জুড়ে অজগর, হরিণ আর বালিশ-তোশক জুড়ে কাড়ি কাড়ি টাকার নোট, তাদের আছে শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল আর একমুঠো স্বপ্ন। অবশ্য এই বেকারত্বের যুগে অভিভাবকরা নাকি সে স্বপ্ন দেখার মতো 'রিস্ক' নিচ্ছে না। সত্যি বলছি, আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে। ক্রমে ক্রমেই আমরা বঞ্চিত হচ্ছি মেধা, দক্ষতা আর যোগ্যতা অর্জন থেকে। তাহলে কী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সন্তানের শিক্ষা গ্রহণের দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল না? এ প্রশ্নটি রইল আজ আমাদের সতের হাজার শিক্ষার্থীর একক অভিভাবক ও একজন সচেতন নাগরিক এবং পত্রিকা পাঠক হিসেবে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কাছে। উত্তরের অপেক্ষায় থাকলেও কিন্তু আমরা আমাদের অভিভাবকদের মতো ঠিক অতটা অসহায় নই। কারণ আমরা চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত হতে পারি, যে সুযোগটা অভিভাবকরা পান না। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অতীতে যতবার ফি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে ছাত্ররা প্রতিবাদ করেছে, গড়েছে প্রতিরোধ। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আর নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অন্যায়ের বিরুদ্ধে চুপ থাকেনি। আমরাও বলছি, শিক্ষাকে বাজারি পণ্যে পরিণত করার এ পরিকল্পনা ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না। একটি মেধাবী মুখ শুধু সামর্থ্যের অভাবে এ ক্যাম্পাস থেকে হারিয়ে যাবে কিংবা প্রবেশই করতে পারবে না, সভ্য সমাজে এ বর্বরতাকে মেনে নেয়ার নাম কাপুরুষতা।

বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটার কথা আমাদের অনেকের মনে আছে নিশ্চয়ই। অত্যাচারী রাজা সবচেয়ে বেশি ভয় পেত দেশের পাঠশালাকে। পাঠশালার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তাই তাকে আওড়াতে শুনি, 'এরা যত বেশি জানে তত কম মানে, বিদ্যা লাভে লোকসান— নাই অর্থ নাই মন, জানার কোন শেষ নাই— জানার চেষ্টা বৃথা তাই'। ছবির শেষ দৃশ্য কিন্তু উপরোক্ত ছান্দিক বাক্যগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে না। সেই পাঠশালার পণ্ডিত আর তার ক্ষুদে বিদ্যার্থীদের কাছে অসহায় রাজার পতনের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে 'অন্যায় করে পার পাওয়া সহজ নয়'। আজ আমাদের শিরদাঁড়া সোজা করা সেরকম 'পণ্ডিত' যেমন চাই তেমন চাই পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিবাদী শিক্ষার্থী।

রিজন, দীপান, নাহার, ন্যান্সি, সুমন, সাজু, লিটন, বিজয়, শিশির, প্রবাল, রাজীব : *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী*